একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Jibanananda Das: A lonely traveler in search of history

Morshedul Alam

জীবনানন্দ দাশ : ইতিহাস-সন্ধানী এক নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক

Name of the Author: Morshedul Alam

Affiliation: Assistant Professor, Department of Bengali, Unahat-Singra Siddiquiya Alim Madrasa, Dupchanchia, Bogra, Bangladesh

Abstract : Jibanananda Das (1899-1954) had a deep understanding of the modern way of life of man; But it was not based on simple equations like other modern poets of the time. Yet this comment of the critic 'Jibanananda, a confused poet of a confused era'- is misleading. Because while searching for the greatest truth of life against time and history, this lonely traveler lit the light like a candle and found the source of the order of the world in the depths of Mind and wisdom. Jibanananda das, a blue-voiced man consumed by life's poison, has spoken of life and hope in a series of poems, composing a cycle of consciousness. By saving himself from contemporary dialectics and doubt, he has become a future converger in the secret light of the lost past, folk life and history-tradition; Having become attached to history, like the historical materialists, they have arrived at optimism in a contradictory way.]

Keyword : Jibanananda das, time and history, great truth, solitary traveler, mind, consciousness.

জীবনানন্দ দাশ : ইতিহাস-সন্ধানী এক নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক

মোরশেদুল আলম

'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ। পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মতো তাঁর কাব্য কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন'[১]- সমালোচকের এই মন্তব্য বিভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ সময় ও ইতিহাসের সপক্ষে জীবনের মহত্তম সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) জোনাকির মতো আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তির সূত্র পেয়েছেন মনীষার গভীরে। এলিয়ট-কথিত ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে জীবনানন্দ একাত্ম; তিনিও বিশ্বাস করেন 'ইতিহাস-চেতনার জন্যে দরকার একধরনের বোধের- যে বোধ হবে যুগপৎ অতীতের অতীত চেতনার এবং অতীতের সমকালীন চেতনার'।[২] কিন্তু শেষ পর্যায়ে জীবনানন্দ এ-চেতনাকে অতিক্রম করে আশাবাদী ও ভবিষ্যৎমুখী হয়ে ওঠেন; অন্যথায় তিনিও পথহীন টি.এস.এলিয়টের মতোই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেন আধ্যাত্মিক অন্ধকারে। বস্তুত, জীবনানন্দ সময়, সমাজ ও ইতিহাস-চেতনাকে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন একই বোধিবিন্দুতে; কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন- 'একজন কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'।[৩]

ইতিহাস-সন্ধানী জীবনানন্দ দাশ কাব্যজীবনে অতিক্রম করে গেছেন দু'টি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে এলিয়ট-কথিত 'অতীতের অতীত চেতনা' এবং 'অতীতের সমকালীন চেতনা'। এ-পর্যায়ে কবি ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত; বোধ ও বোধিতে কেবল পোড়ো মাটি আর ফাঁপা মানুষ। তবুও জীবন-উত্তরণস্পৃহা এই প্রথম পর্যায়েই দানা বাঁধে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আশাবাদী হয়ে ওঠেন, ব্যস্ত হয়ে ওঠেন জীবনের এক মহত্তম গতিশীলতা আবিষ্কারে। প্রথম পর্যায়ে তিনি সংশয়-সঙ্কুল বলেই বহির্জগৎ ছিন্ন করে অন্তর্জগতে আশ্রয়ী। এর ফলে একদিকে মগ্নচৈতন্যের অভিসার তাঁকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে, বর্তমান থেকে ঐতিহ্যের আলোকে নিয়ে গেছে। এটি ছিলো একান্ত আশ্রয়। অন্যদিকে বর্তমান পৃথিবীর আত্মিক শূন্যতা তাঁকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে গেলেও সেখানে স্বস্তি পাননি তিনি। কেননা, জীবনানন্দ জানতেন- বস্তুজগৎ অন্তরের স্বপ্নজগৎকে ভ্রান্তি বলে প্রমাণ করে দেবে এবং বস্তুজগৎ যদি আমাদের নিকট নঞর্থক হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অন্তর্চেতনাও নঞর্থক হয়ে যাবে। কিন্তু বাইরের জগৎ কেবল বর্তমান যুগের মূল্যবোধেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি প্রাণদায়িনী উৎসের সন্ধানে যাত্রা করলেন, খুঁজলেন বহুবর্ণিল ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যে পেগান গ্রীস, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর, কনফুসিয়াসের চীন, ধর্মাশোকের ভারতবর্ষ। প্রথম পর্যায়ে 'ঝরা পালক' (১৯২৮) কাব্যে কবি অতীত মুখী; তাঁর জীবনবোধের সমান্তরালে প্রবহমান প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ উল্লেখে লুপ্ত-গুপ্ত রহস্যময়তাস্পর্শী। এ-যেন জৈবিক জন্মান্তরের মাধ্যমে বর্তমানের সঙ্গে সুদূর অতীতের মেলবন্ধনের প্রয়াস। তিনি ছিলেন প্রভেনস প্রান্তরে, ব্যবিলনে, আসীরীয় সম্রাটের বেশে, ছিলেন স্পেইনের দস্যুরূপে। কিন্তু সমুদয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতনতার মূলে একটি নৈঃসঙ্গ্যবোধ সংবেদনশীল কবির মর্মকোষে ক্রিয়াশীল সতত;

অনিবার্য পরিণামে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তিনি অতীতের ঐশ্বর্যকে রিক্ততার প্রতিচ্ছবিই করে তুললেন মূলত এবং এর অন্তর্মূলে সক্রিয় এলিটীয় বোধ দুর্লক্ষ্য নয় :

'দুশ্চর দেউলে কোন্, কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর-ব্যবিলন-মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে ঈসিসের বেদিকার মূলে।'[৪]

'ঝরা পালক' কাব্যে জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনা মূলত অসহায়তার প্রতীকভাষ্য; তার অনিবার্য পরিণতি ধ্বংসশীলতা। ফলে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)-তে কবিকে আচ্ছন্ন হতে দেখা যায় মৃত্যুচিন্তায়। এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতিচারী শিল্পদৃষ্টির অনুপুঙ্খ, গভীর এবং ব্যঞ্জনাবহুল পরিচয় উৎকীর্ণ হলেও এ-কাব্যের 'মাঠের গল্প'-র অন্তর্গত 'মেঠো চাঁদ', 'পেঁচা', 'পঁচিশ বছর পরে', 'কার্তিক মাঠের চাঁদ' শীর্ষক কবিতাসমূহে জীবনানন্দ পোড়ো জমি, হেমন্ত ঋতু, শস্যহীন মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, কুয়াশা, হলুদ রঙ, চড়ুইয়ের ভাঙা বাসা, পচা চালকুমড়া, নষ্ট শসা ইত্যাদি বহুবর্ণিল প্রকৃতির অনুষঙ্গ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন- যা অভিব্যঞ্জিত করে তুলেছে ইতিহাস-সন্ধানী এক নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের নৈরাশ্যমগ্ন, সম্ভাবনারিক্ত ভবিষ্যৎ স্বপ্নহীনতাকে। এর অনুপ্রাণনশক্তি টি.এস.এলিয়টের 'The Waste Land'-এর চিত্রকল্প। সেখানেও বর্তমান বন্ধ্যা, সম্ভাবনাহীন; কোথাও বৃষ্টি নেই, অথচ তারই জন্যে হাহাকার, ব্যাকুলতা। এলিয়টের ভাষায় :

'Here is no water, but only rock
Rock and no water.'[৫]

-একই অনুবর্তন সংলক্ষ্য যেন জীবনানন্দেও :

'শস্য ফলিয়া গেছে,- তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে একা একা! -ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি- খড়-নাড়া- মাঠের ফাটল...
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল।'[৬]

-এখানে 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে', শূন্য ধানক্ষেত, আর তার আল ও ঊর্ধ্বমুখী খড় যেন মূর্তিমান হাহাকার, কেবল 'জমিছে ধোঁয়াটে/ ধারালো কুয়াশা'। হেমন্ত-অনুর্বর আর কুয়াশা-দুঃসময়- এই দুই অনিবার্য প্রতীকে ঘিরে আছে যেন বিশ্ব-চরাচর :

'দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ-অবসাদ-
আমাদের ডেকে লয়,- তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।
তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে, রোদ গেছে প'ড়ে-...
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার
শাদা মরা শেফালীর বিছানার 'পর।'[৭]

তবে 'বনলতা সেন' (১৯৪২) পর্যায়ে কবিকে ইতিহাস-সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায় পুনরায়। এ-কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতায় বর্তমান প্রেমের অচরিতার্থতায় কবি প্রকৃত প্রেম ও সৌন্দর্য সন্ধান করেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকাল-সীমাবদ্ধ নাটোরের প্রকৃতি-কন্যা বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং ইতিহাসবোধ। আর এই দুই আয়তন-যোগে কবিতাটি পেয়েছে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি :

'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক; চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।'[৮]

'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সামসময়িক। এটি কবির পুনর্জাগরণের শিল্পফসল। সমকালের অস্থিরতা, যুগযন্ত্রণা ও সামূহিক সঙ্কটের বিপ্রতীপে 'রূপসী বাংলা'-য় রূপায়িত হয়েছে শান্ত-সমাহিত-নিরুদ্বিগ্ন শ্যামল প্রকৃতি। স্বপ্নমগ্ন কবি জীবনানন্দ এখানে মোহমুগ্ধ, নিসর্গের রূপ অন্বেষণে ব্যস্ত। ক্লান্তি-অবসাদে বিপর্যস্ত ইতিহাস-সন্ধানী কবির এটি স্মৃতিবিধুর পলায়ন; উত্তরণ বলা যায় না মূলত :

'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে।'[৯]

-বহমান সত্যের সাথে লুপ্ত অতীত ইতিহাসের যোগ শাশ্বত জীবনের শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র; এবং নিসর্গ এখানে আশ্রয়স্থল যথারীতি। নিসর্গ-বিনাশী সভ্যতার বিরুদ্ধে ইতিহাস-সচেতন কবি এখানে যেমন উচ্চকিত, তেমনি বাংলার আবহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং লোককাহিনি-মিথ-পুরাণ ও রূপকথার অতীত ভুবনেও তাঁর পদচারণা সমুজ্জ্বল। বাংলার মুখ ভুলে কবি 'রূপহীন প্রবাসের পথে' 'খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন' জীবন কাটাতে চান না। কারণ তাঁর 'জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়, চারিদিকে বাঙালির ভিড়'। জীবনানন্দের মৃত্যু-পরবর্তী জন্মান্তর বা রূপান্তরভাবনা তাঁর নিসর্গের প্রাণবীজের মধ্যে নৈকট্য-লাভের আতীব্র বাসনাকেই মূলত ব্যক্ত করে :

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হ'ব- কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়।'[১০]

-এই প্রকৃতি-সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় জন্মান্তরের ইঙ্গিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও দুর্লক্ষ্য নয় :

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল- সোনা ছিল যাহা...
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালীর ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!'[১১]

সময় ও ইতিহাস-সচেতন কবি জীবনানন্দের পক্ষে অবিমিশ্র স্বপ্ন-প্রয়াণ সম্ভব হয়নি অবশেষে- মৃত্যুচিন্তা হানা দিয়েছে বার বার; ইতিহাস, ঐতিহ্য, মিথ, মানুষ ও নিসর্গের মিথষ্ক্রিয়া কাব্যের আবহ করেছে বিষণ্ণ। লোকজ-মিথিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বেহুলা এবং নিসর্গ মিলেমিশে একীভূত হয়েছে এখানে এবং এই মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নৃত্যের মাধ্যমে :

'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ-বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,- একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়-
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'[১২]

'রূপসী বাংলা' কাব্যটি বস্তুত জীবনানন্দের স্বপ্ন-প্রয়াণ, একান্ত নিজস্ব ভাবলোকে বঙ্গভূমি তথা মাতৃভূমির শেকড় সন্ধানের শিল্পভাষ্য। ইতিহাস-সম্পৃক্ত হয়েই সেই মাতৃভূমি বাংলা রূপ পায় যেন : 'বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে'। প্রকৃতপক্ষে এ-পর্যায়ে কবি অতীত-চেতনা, সমকাল-চেতনা ও স্বপ্ন-প্রয়াণের দ্বন্দ্বে সামান্য বিচলিত ছিলেন বলে বোধ হয়। তিনি যখন 'সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়ে'র বন্দনা করছেন, তখন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে বলছেন :

'চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র
মধ্যযুগের অবসান;
স্থির করে দিতে গিয়ে ইউরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রিস্টান।...
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন।'[১৩]

অবশেষে সমুদয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুক্তি ঘটেছে; কবি শুনতে পেয়েছেন 'চারিদিকে রক্ত-ক্লান্ত কাজের আহ্বান'। যদিও 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ', তবুও তো মানুষ 'ঋণী পৃথিবীরই কাছে'। এই ঐতিহাসিক বোধ ও অভিজ্ঞান কবিকে করে তুলেছে ভবিষ্যৎমুখী ও আশাবাদী :

'এই পথে আলো জ্বেলে, এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে...
শিশির-শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'ল হবে মানুষের যা হবার নয়-
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।'[১৪]

ইতিহাস-চেতনা কবিকে সমাজ-চেতনার পথে নিয়ে গেছে, তাঁকে অতীত থেকে করেছে ভবিষ্যৎমুখী। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ অথবা যান্ত্রিক যুগের হৃদয়হীনতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি দেখেছিলেন 'এশিয়ার মাঠে চরা' শকুনের প্রতীকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন' পর্যায়ে জীবনানন্দ ছিলেন অতীত-বিহারী, কিন্তু 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪)-তে তিনি অতীত ও বর্তমানকে দেখলেন ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে। কবি দেখলেন মানবাত্মার অপমান- একদিকে দম্ভের ব্যবিলন উঠছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী সিংহের হুঙ্কার। তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছেন 'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে'। এখন সন্ধ্যা প্রায়; একটি সোনালি সকালের প্রত্যাশা কবির, কিন্তু 'সে-সকাল কখনো আসেনা ঘোর, স্বধর্ম-নিষ্ঠ রাত্রি বিনে'।- এই ঐতিহাসিক বোধ, বোধি ও চৈতন্যই ইতিহাস-সন্ধানী কবি জীবনানন্দকে করে তোলে আশাবাদী :

'আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে-সব জ্যোতি
দেশলাই কাঠি নয় শুধু আর- কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হলে কী করে চলে-
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না; লাখো-লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও: পিরামিড গড়ে- পিরামিড ভাঙে গড়ে।'[১৫]

'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) জীবনানন্দ দাশের ইতিহাস ও সমাজ-সচেতনতার শৈল্পিক কাব্যরূপ। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্নায়ুযুদ্ধের চাপে বিপর্যস্ত কবি যুগের অপরাহ্নকে অবলোকন করেছেন, কিন্তু আচ্ছন্ন হননি তাতে। স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন- 'আমরা তো তিমিরবিনাশী'। অন্যত্র বলেছেন- 'সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে'[১৬]। এই চেতনার উত্তরণটি ঘটেছে মূলত ইতিহাস-সচেতনতার আশাবাদ এবং গতিশীলতার ধারণায়। যেমন- ক্লান্তিহীন-শ্রান্তিহীন পথ-সন্ধানের চিত্র:

'ব্যবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উড়ের আরশি থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও- দুপুর বেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু- গেৎসিমানি- আলেকজান্দ্রিয়ায়
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পেছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো,

তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর দিকচক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন রয়ে গেছে- যতদিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে...
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি-নাবিক-অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।'[১৭]

-কবির গতিশীলতার এই ধারণা গড়ে উঠেছে মূলত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের মতো। 'অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে/ কেবলি গতির গুণগান গেয়ে'- এই চেতনার নামই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। অনবরত সংগ্রাম আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই জীবন বিকশিত হয় মূলত; এবং কবি যেন সেই শ্রেণি-সংগ্রামেরই কথা বলে যান অবিরত:

'অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়;
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই-
কোথাও আঘাত ছাড়া- তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।'[১৮]

-উপর্যুক্ত বক্তব্যের মৌলসূত্র ধরে কবি জীবনানন্দের সময় ও ইতিহাস-সম্পর্কিত অভিজ্ঞান:

'সময় কেবলি নিজ নিয়মের মতো; তবু কেউ
সময়-স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়।
ভেঙে যায়-
যত ভাঙে, তত ভালো।'[১৯]

ভারতবর্ষের পরাধীনতার বেদনা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামূহিক ব্যর্থতা, উত্তর-স্বাধীনতার রক্তাক্ত যন্ত্রণা এবং বহুভুজ ঐতিহাসিক বিপর্যয় নির্মাণ করেছে জীবনানন্দ দাশের 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের বহুবিস্তীর্ণ পটভূমি। এ-পর্যায়ে এসে কবির মনে হয়েছে- ইতিহাসের সমুদয় অন্ধকার যুগ মিলেমিশে এক অন্ধকারতম যুগের প্রবর্তন করেছে যেন। সর্বায়ত হতাশা ও সামূহিক নৈরাজ্যের সমাজমনস্ক উপলব্ধি 'সাতটি তারার তিমির' এবং সামসময়িক অন্যান্য কাব্যে প্রতিবেশ-চেতনার শক্তিতে এত প্রবলভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়েছে যে এমনকি ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় প্রয়াণ-প্রেরণায় জীবনানন্দ দাশ কখনো কখনো আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন বলে আমাদের ভ্রম হতে পারে:

'ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে;
হয়তো বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া- গোলক ধাঁধার
ভুলের ভেতর থেকে আরো বেশি ভুলে।'[২০]

-কিন্তু যে নিগূঢ় ইতিহাস-সত্যে তিনি আস্থাশীল থেকেছেন আজীবন, যা তাঁকে সিন্ধুসারসের গানে একদা শুনিয়েছিলো হতাশাময় রাত্রির অবসান-সঙ্গীত, যার অমেয় প্রেরণায় কোনো অন্তিম সূর্যকরোজ্জ্বল মানবসমাজের স্বপ্নরচনা করেছেন- সেই প্রত্যয়ের অপরিমেয় শক্তিতেই বলতে পারেন তিনি:

'ইতিহাসে মাঝে মাঝে এ রকম শীত-অসারতা
নেমে আসে, চারিদিকে জীবনের শুভ অর্থ রয়ে গেছে তবু।'[২১]

সর্বপ্লাবী হতাশা, সংক্ষোভ, ক্রোধ মিশে আছে যেন ইতিহাসের বহুমাত্রিক অনুষঙ্গে; তাই 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে' কবির কাছে মনে হয় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো'। কিন্তু তবুও ইতিহাসের এই বিপুল অবসাদের অধ্যায়েও 'নব-নবীনের প্রাক সাধনা' চলছে ক্রেমলিনে, লন্ডনে- যা কবিকে আশাবাদী করে তুলেছে অন্তর্চেতনায়। কবিচৈতন্যের অগ্রযাত্রায়, ইতিহাস-অভিজ্ঞানে, অভিযাত্রায় 'রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে' 'শুশ্রূষার মতো শত' জলঝর্নার ধ্বনি শুনেছেন তিনি:

ভাবা যাক- ভাবা যাক-
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।'[২২]

'আলোপৃথিবী' (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ দাশ আলোক-প্রত্যাশী এবং তা সঙ্গতকারণেই ইতিহাস-প্রাণবীজের গতিশীলতায় ক্রম-উত্তরণমুখী। জীবনে যে আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, তা প্রথম পর্যায়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়েছিলো প্রবল শক্তিসহ; কিন্তু অন্তিমপর্যায়ে জীবন আলোর অধিকারে সমাহিত। এ-পর্যায়ে 'যাযাবর ইতিহাসসহ পথ চিনে নিতে চায়'। ইতিহাস-অন্বেষাই কবিকে তীব্র আশাবাদী হতে শক্তি যুগিয়েছে। যদিও পৃথিবী আজও রণ-উন্মত্ত, তবুও তা 'বহতা নদীর মতো'। সন্দেহ নেই, এই অবিশ্রান্ত গতিধারা তাঁর অভিজ্ঞানঋদ্ধ ইতিহাস-সচেতনতায় সমীকৃত হয়েছে মূলত :

'পৃথিবীতে হৃদয়েরো গতিপথে বর্ণালির আভা
সম্পূর্ণ দীপির মতো আলোকিত- ক্রমে আলোকিত হতে চায়।'[২৩]

পরিশেষে কবি আহ্বান জানান ইতিহাস-চেতনারূপ এক অদ্বয় পাখিকে; সে চেতনা অগ্রসরমানতার দ্যোতক এবং সে কারণেই সঞ্জীবনী- 'সূর্যে আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও, প্রাণ দাও পাখি'। এই পাখির অনুষঙ্গেই এসেছে ভোরের কাকলি, 'পুনরুদয়ের ভোর' বা সূর্যোদয়ের ছবি। এভাবেই তাঁর অন্তিমপর্যায়ের কবিতামালায় বারবার ঘোষিত হয়েছে ইতিহাসবোধে দীপ্ত এক নবীন প্রত্যুষের আস্থাবাণী। যে প্রবল আস্তিক্যবোধ শেষপর্যন্ত তাঁর পরিণত রচনাগুলিকে উত্তীর্ণ করেছে সকল তিমিরাচ্ছন্নতার ঊর্ধ্বে তিমিরবিদারী সৌরকরোজ্জ্বলতায়, তা জীবনানন্দের গভীর অর্থবহ ইতিহাস-চেতনা থেকেই ক্রম-উৎসারিত :

'ইতিহাস সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়, চলা যায় সময়ের পথে-
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয় জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো

অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো।
সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে-
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।'[২৪]

প্রকৃতপক্ষে, জীবনানন্দ দাশ তিরিশোত্তর কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর কিন্তু অন্তর্জটিল; সমকাল-বিক্ষুব্ধ কিন্তু স্থিতধী এবং প্রাণাবেগে রক্তাক্ত কিন্তু লক্ষ্যমুখী। তিনি সমকালকে আত্মস্থ করেছেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন এবং উভয়ের দ্বন্দ্বমূলক মিথষ্ক্রিয়ায় অবশেষে উত্তীর্ণ হয়েছেন মীমাংসায়; ভবিষ্যৎ জলঝর্নার কলস্বরে শুনেছেন শুশ্রূষার অমেয় বাণী। তিনি মূঢ় কিংবা বিমূঢ় নন; তিনি এক জটিল সময়ের জটিল মীমাংসার অগ্রণী। এ-জন্যে সময়, সমাজ, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অনুধাবন ও আত্মস্থ করবার প্রয়োজন ছিলো শৈল্পিক নিষ্ঠায় এবং সে দাবি তিনি পূর্ণ করেছেন। সচেতনভাবেই তিনি বলেছেন- 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি'[২৫]। বলতে দ্বিধা নেই, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইতিহাস-অন্বেষক কবিমানসের যে বিবর্তন সুলক্ষ্য, তা মূলত তাঁর স্ব-কথিত সময়চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়েই ক্রম-সম্প্রসারিত, তীক্ষ্ণমুখী।

তথ্যনির্দেশ

১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', ৫ম সং-১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১১৭।
২. Eliot, T.S., "Tradition & Individual Talent", 'Selected Essays', 1950, Brace & Co, New York, P. 89 ।
৩. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', ২য় বাংলাদেশ সং-২০১৩, বুক ক্লাব, ঢাকা, পৃ. ৩৩।
৪. তদেব, "অস্তচাঁদে", 'ঝরা পালক', *জীবনানন্দ রচনাবলী-১ম খণ্ড*, সম্পা. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সং-১৯৯১, গতিধারা, ঢাকা।
৫. Eliot, T.S, 'Collected Poems (1909-35)', Brace & Co, New York ।
৬. দাশ, জীবনানন্দ, "মেঠো চাঁদ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', ৯ম সং-১৪০১ বঙ্গাব্দ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
৭. তদেব, "অবসরের গান", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পূর্বোক্ত।
৮. তদেব, "বনলতা সেন", 'বনলতা সেন', ২১ তম সং-১৪০০ বঙ্গাব্দ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
৯. তদেব, "সনেট-১", 'রূপসী বাংলা', ১৮ তম সং-১৪০০ বঙ্গাব্দ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
১০. তদেব, "সনেট-১৫", 'রূপসী বাংলা', পূর্বোক্ত।
১১. তদেব, "মৃত্যুর আগে", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পূর্বোক্ত।
১২. তদেব, "সনেট-৩", 'রূপসী বাংলা', পূর্বোক্ত।
১৩. তদেব, "সবিতা", 'বনলতা সেন', পূর্বোক্ত।
১৪. তদেব, "সুচেতনা", 'বনলতা সেন', পূর্বোক্ত।
১৫. তদেব, "প্রার্থনা", 'মহাপৃথিবী', ২য় সং-১৪০০ বঙ্গাব্দ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
১৬. তদেব, 'ময়ূখ', পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৩০।
১৭. তদেব, "নাবিক", 'সাতটি তারার তিমির', *জীবনানন্দ রচনাবলী-১ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত।

১৮. তদেব, "সময়ের কাছে", 'সাতটি তারার তিমির', পূর্বোক্ত।
১৯. তদেব, "দীপ্তি", 'সাতটি তারার তিমির', পূর্বোক্ত।
২০. তদেব, "যতদিন পৃথিবীতে", 'বেলা অবেলা কালবেলা', *জীবনানন্দ রচনাবলী-১ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত।
২১. তদেব, "পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে", 'বেলা অবেলা কালবেলা', পূর্বোক্ত।
২২. তদেব, "হে হৃদয়", 'বেলা অবেলা কালবেলা', পূর্বোক্ত।
২৩. তদেব, "পৃথিবী ও সময়", 'আলোপৃথিবী', ২য় সং-১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থালয়, কলকাতা।
২৪. তদেব, "অন্ধকার থেকে", 'বেলা অবেলা কালবেলা', পূর্বোক্ত।
২৫. তদেব, 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।